Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-III, April 2024, Page No.94-109
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মাড়াই পূজার একটি ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক অন্তর্দৃষ্টি

বাবলী বর্মন

পি.এইচ.ডি গবেষক, বাংলা বিভাগ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Marai, the goddess of North Bengal, is another name for Goddess Mansa and is worshipped by the Rajbanshi communities. Rajbanshi people worship this goddess for the fear of snakes, the well-being of children, and the prosperity of families. However, Marai Puja is performed with devotion, reverence, and ideal etiquette by the Rajbanshi Community. Additionally, the Pala song of the Bishahara group or Dal is strongly associated with this Marai Puja, and worship of the goddess is incomplete without this song. Mansa Purana has been prevalent in North Bengal since the medieval period, but it nowadays is almost extinct among Rajbanshi community. This study explores the relevance of Marai Puja and Bishahara groups in the Rajbanshi community. Furthermore, this study highlighted the folklore, traditional folk songs, and ample portrayal of Marai idols. Only those who have been worshipping Marai for generations have practised this worship; otherwise, it appears that worshipping of Marai Goddess has declined significantly among Rajbanshi community. The same pertains to the traditional folklore of the Bishahara Group or Bishahari songs, which are associated with Marai Puja. From the field interviews, senior members of Bishahara Dal or group essence of each traditional folks, folklore, rituals, and customs of Marai Puja. This study provides the potential for fostering spiritual/religious goddess worship and also conserving folk culture, traditional rituals in the local community.

Keywords: Marai Puja, Rajbanshi community, Bishahara Dal or groups, Marai Idol, Folklore of Marai Puja.

মাড়াই পূজার উৎপত্তি, আঞ্চলিক বিস্তার এবং প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনি: কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা অর্থাৎ পুরো উত্তরবঙ্গে, আসামে, বাংলাদেশের রংপুরে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজ আপন ভাষা, সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যাবস্থায় নিজেদের জীবনধারা চালিয়ে এসেছে। তাঁদের নিজস্ব সমাজ রীতিতে কিছু প্রথা সংস্কার, উৎসব বংশ পরম্পরায় অনুসৃত হয়ে এসেছে। অন্য সকল দুর্গা, কালী, শিব, বিষ্ণু, রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী প্রভৃতি পূজার প্রচলন যেমন আছে, তেমনি নিজস্ব রীতির পূজাও আছে রাজবংশী সমাজে। এমনি একটি পূজা হল মাড়াই পূজা। মড়ার আই অর্থাৎ মড়া সৃষ্টি করে যে মা তিনিই 'মড়াই' অপভ্রংশে মাড়াই। আবার মারী আই অর্থাৎ যে আই বা মা মারেন, সংহার করেন, তিনি মাড়াই। বিষের আধাররূপী এই মা মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়েই আসেন বিরোধী

শক্তির কাছে। আবার তাঁর অনুগত ভক্তের কাছে তিনি বরাভয় দাত্রী, ধন-সম্পদে ভরে দিয়ে সুখে সমৃদ্ধিতে ভক্তের শ্রীবৃদ্ধি করেন। তিনি বিষ অর্থাৎ অন্যায়রূপী সকল প্রতিকূলতাকে হরণ করেন তাই তিনি 'বিষহরী'। প্রচলিত ভাষায় 'বিষহরি'। বিষহরি দেবী ভগবতী। দেবী ঐশ্বরিক শক্তিতে শক্তিময়ী, এই ভগবতী বিষহরিকে অবলম্বন করে রাজবংশী সমাজে ভক্তিমূলক পালাগান লেখা হয়েছে। এই পালা গানের নাম 'বিষহরি' বা 'বিষহরী' বা 'বিষহরা'। মান্য ভাষায় এটি 'পদ্মপুরাণ' বা 'পদ্মাপুরাণ' এর গান নামে পরিচিত। এই পালাগান মান্যচলিত বাংলা ভাষাতে যেমন করা হয় আবার রাজবংশী ভাষাতেও করা হয়। এই পালাগান যারা করেন তাঁদের 'গীদাল' (পুরুষ হলে) বা 'গীদালী' (মহিলা হলে) বলা হয়। আর এই মাড়াই দেবীকে যে গৃহস্থ পূজা দেন তাকে 'মাড়েয়া' বলা হয়ে থাকে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও আসামের কিছু অংশে এই পূজার প্রচলন বেশি।

দেবী পদ্মার প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনি: দেবী পদ্মা মহাদেবের কন্যা বলে পরিচিতা। তাঁর জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে প্রচলিত যে একদিন মহাদেব পদ্মবনে বেড়াতে যান। সেখানে বেল গাছের জোড়া বেলফল দেখে তিনি পত্নী চন্ডীকার স্তনযুগলের কল্পনা করেন এবং তাতে মহাদেব কামার্ত হয়ে পড়েন। ফলে তাঁর বীর্য পদ্মের পাতায় স্খলিত হয়। ক্ষমা নামের এক পক্ষিণী অমৃত মনে করে তা খেয়ে ফেলেন। কিন্তু বীর্যের তীব্র জ্বালা পক্ষিণী সইতে না পেরে কালীদহের তীরে অবস্থিত পদ্মবনে পদ্মের পাতার উপরে তা উগরিয়ে দেয়। সেই তেজঃরূপী বীর্য পদ্মের নল বেয়ে পাতালে চলে যায়। পাতালের নাগরাজ বাসুকি ধ্যানযোগে সেই বীর্যকে মহাদেবের বীর্যরূপে চিনতে পারেন। তখন বাসুকি কূর্মের সাহায্য নিয়ে নির্মানীয়া নামে এক কন্যাকে সেই তেজঃপুঞ্জ দিয়ে মহাদেবের লক্ষণ বিশিষ্ট একটি কন্যা সৃষ্টি করতে বলেন। অপূর্ব সুন্দরী এক কন্যার সৃষ্টি হয়। তাঁর মাথায় সর্পফণা ও শরীর রূপে আকর্ষণীয় হয়। বাসুকি মহাদেবের দেওয়া বিষ দিয়ে পদ্মার রূপ নির্মাণ করেন জন্য পদ্মা বিষহরি' নামে পরিচিতা হন। এরপর পদ্মা বড় হলে বাসুকি তাকে মহাদেবের কাছে পদ্মবনে পাঠিয়ে দেন। মহাদেব যৌবনবতী সুন্দরী কন্যা পদ্মাকে দেখে কামার্ত হয়ে পরেন এবং পদ্মাকে রতিদানে আহ্বান জানান। পদ্মা তখন 'হরের দুহিতা' বলে নিজের পরিচয় দিলে শিব তার প্রমাণ চান। তখন পদ্মা সর্প পরিবৃতা হয়ে নিজের রূপ ধরে মহাদেবের দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকান ও তখনি মহাদেব মৃত্যুর কোলে ঢলে পরেন। এই অবস্থা দেখে স্বর্গের সকল দেবতারা ছুটে আসেন। সকলে পদ্মার স্তুতি করে তাকে মহাদেবের প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানান। দেবগণের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে পদ্মা পিতার প্রাণ ফিরিয়ে দেন। শিব বেঁচে ওঠেন। এরপর শিব নিজের কন্যাকে নিয়ে কৈলাসে ফিরে যান। পদ্মাকে নিজের মানসজাত কন্যা বলে মনে করেন শিব, তাই পদ্মার আর এক নাম হয় মনসা।

শিব পদ্মাকে নিজগ্রেহে নেয়ে এলে দেবী চন্ডী পদ্মাকে সতীন মনে করে প্রচন্ড অত্যাচার শুরু করেন। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পদ্মা রেগে গিয়ে সর্পরূপ ধরে চন্ডীকে দংশন করেন। চন্ডী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। পরে শিবের অনুরোধে পদ্মা চন্ডীকে পুনর্জীবিত করেন। এরপর যথা সময়ে পদ্মার জরৎকারু মুনির সঙ্গে বিবাহ হয়। বিবাহের পর একদিন জরৎকারু মুনি দিনের বেলায় ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু নাগের ফণায় সূর্যকিরণ ঢেকে যাওয়ার কারণে পদ্মা জরৎকারু মুনিকে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন সন্ধ্যা মনে করে। সেই সময় দক্ষিণে সূর্যের অন্ধকার সরে আলো দেখা দিলে জরৎকারু পদ্মার প্রতি ক্রুদ্ধ হন মিথ্যে বলার কারণে। এইজন্য তিনি পদ্মাকে ত্যাগ করেন। কিন্তু পতি বিহনে পদ্মার দুঃখের কথা শুনে জরৎকারু পদ্মার পেটে হাত রাখলে পদ্মার গর্ভে সন্তান আস্তিকের জন্ম হয়। আস্তিক বড় হলে পিতার সাথে বনে তপস্যায় চলে যান। বিষহরি একা কালিদহে বিরাট পুরী নির্মাণ করে থাকতে আরম্ভ করেন। তাঁকে সর্পদেবী রূপে

অনেকেই পূজা করতে শুরু করে কিন্তু অন্য দেব-দেবীর পূজা মর্ত্যে যেভাবে প্রচলিত মনসার বা দেবী পদ্মার পূজা ততটা প্রচলিত নয়। তাই তিনি মর্ত্যের মহাপ্রতাপশালী চাঁদ সদাগরের থেকে পূজা পেতে চাইলেন। চাঁদ পদ্মাকে পূজা দিলে মর্ত্যের সকলেই পদ্মার পুজা করবে। কিন্তু চাঁদ সদাগর ছিলেন একনিষ্ঠ শিব ভক্ত। তিনি কিছুতেই মনসা বা পদ্মার পূজা করবেন না। চাঁদের ছয় পুত্রের মৃত্যু, তাঁর সাধের গুয়াবাড়ি ধ্বংস, সপ্তডিঙা নদীতে ডুবে গেলেও চাঁদ সদগর দেবী পদ্মাকে পূজা দিতে রাজি নন। অবশেষে চাঁদ সদাগরের সর্বশেষ পুত্র লখিন্দরের বিবাহের রাতে বাসরঘরে সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। পুত্রবধূ বেহুলা নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে স্বর্গে পৌঁছান এবং দেবগণকে তুষ্ট করে স্বামী লখিন্দরের জীবন ফিরিয়ে আনেন। বেহুলা ছয় ভাশুরের জীবন ও সপ্তডিঙা সহ চাঁদ সদাগরের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনেন। পুত্রবধূর আসাধ্য সাধনে ও বেহুলার কথায় অবশেষে সদাগর বাঁহাতে দেবি মনসাকে ফুল জল দিয়ে পূজা দেন। তখন থেকেই বিষহরির পূজা ব্যাপকভাবে মর্ত্যে চালু হয়। এই কাহিনিই বিষহরা গানের মধ্য দিয়ে বর্ণনা করা হয় এবং বিষহরির মাহাত্ম্য প্রচার করা হয় পালাগানের মাধ্যমে।

ক্ষেত্র এলাকার মানচিত্র:

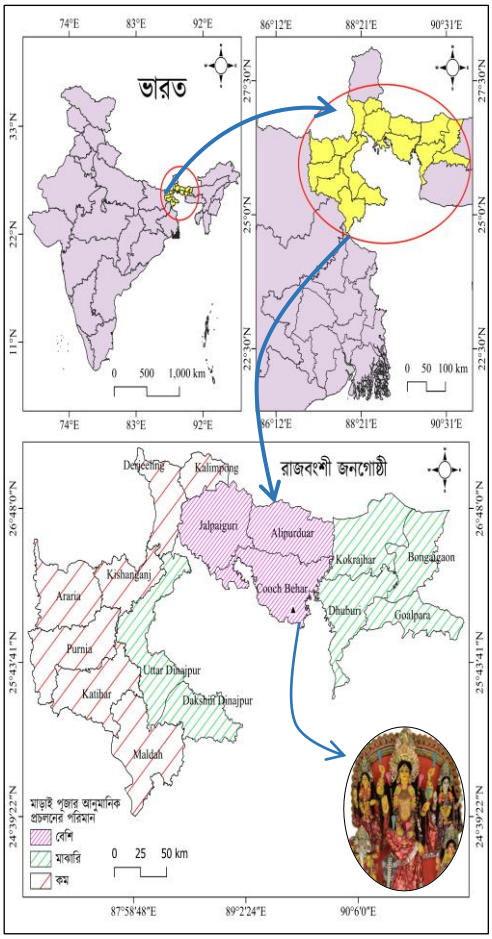

চিত্র ১. ক্ষেত্র এলাকার মানচিত্র

ক্ষেত্র গবেষণার উদ্দেশ্য: বর্তমান রাজবংশী সমাজের লৌকিক পূজা ও রীতিনীতি প্রায় বিলুপ্তির পথে। আজ থেকে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে যেভাবে এই রাজবংশী সমাজের মানুষজন লৌকিক পুজা ও রীতিনীতির গুরুত্ব দিয়েছিল তা আজ অবলুপ্তপ্রায়। ঠিক এই অবলুপ্তির পথের প্রথম সারির সাক্ষী হল মাড়াই পূজা। মাড়াই পূজার সাথে জড়িত যে লোকগান, লোককথা, দান-দক্ষিণা ও রীতিনীতি তা আজ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। আর যদিও হয়ে থাকে তা কেবল প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই এই রাজবংশী সমাজের মাড়াই পূজার সেকালের এবং একালের ভিত্তিতে কিছু উদ্দেশ্য নিম্নে তুলে ধরা হল -

1) মাড়াই পূজার সামগ্রিক চিত্রের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।
2) বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে রাজবংশী সমাজের মাড়াই পূজার প্রাসঙ্গিকতা ও বিষহরা দলের প্রেক্ষাপট উপস্থাপন।
3) মাড়াই পূজার সাথে জড়িত লোকাচার, লোকগান ও সম্পূর্ণ মাড়াই মূর্তির উপস্থাপন।
4) রাজবংশী সমাজে মাড়াই পূজার প্রাসঙ্গিকতা, মূল্যবোধ, ও পরামর্শ।

গবেষণা পদ্ধতি: প্রথমত, রাজবংশী সমাজের মাড়াই পূজার সামগ্রিক ক্ষেত্র গবেষণাটি হল একটি গুণগত বা মানগত গবেষণা (Qualitative Research) । গুণগত গবেষণার অন্যতম একটি উপবিভাগ হল সাংস্কৃতিক গবেষণা (Cultural research) আর এই ক্ষেত্র সমীক্ষাটি হল এর অঙ্গ বা অন্তর্গত।

দ্বিতীয়ত, নমুনায়ন কৌশল (Sampling Techniques) হিসাবে আমি নিঃসম্ভবনা নমুনায়নের (Non-Probalibilty Sampling) উপ-বিভাগীয় পদ্ধতি উদ্দেশ্য ভিত্তিক নমুনায়ন (Perposive Sampling) ব্যবহার করেছি। এই পদ্ধতিতে মাড়াই পূজার লোকাচার, পূজার সাথে যুক্ত মানুষজন ও তাঁদের বৈশিষ্ট্য গুলিকে উদ্দেশ্যভিত্তিক হিসাবে নমুনায়ন করা হয়েছে। আর রাজবংশী সমাজে যারা অনেকদিন ধরে এই পূজার রীতিনীতি ও পূজাচারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাঁদেরকে আমি উদ্দেশ্যভিত্তিক নমুনায়ন হিসাবে যুক্ত করেছি। এই উদ্দেশ্যভিত্তিক নমুনায়নের একটি সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকার বা কথোপকথন তুলে ধরা হয়েছে। মাড়াই পূজার মূর্তির রূপ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একটি মাড়াই দেবীর মূর্তি উপস্থাপন করা হয়েছে।

মাড়াই মূর্তির রূপ বর্ণনা এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ

মাড়াই পূজার মনস্কামনা: সর্পভয় তথা সংসারের দুঃখ-দুর্দশা দূর করে সুখী সংসার পরিচালনার স্বার্থে রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির মানুষ বিষহরি পূজা করেন। রাজবংশী প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই বিষহরি বা মনসা পূজা করা হয়। মাড়াই পূজা রাজবংশী ছাড়া স্থানীয় যোগী, খেন, জেলে, কুমার, কামার প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষও এই পূজা করে থাকেন। মানত থাকলে এই পূজা করা হয়। আবার ছেলের বিয়েতে ও সন্তানের অন্নপ্রাশনে মাড়াই পূজা প্রায় আবশ্যিক একটি অনুষ্ঠান। মানত ছাড়াও রাজবংশীরা সর্পভয় দূর করতে এবং সংসারের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য এই পূজা ও সঙ্গে বিষহরা গান দিয়ে থাকেন।

মাড়াই পূজার তিথি: পশ্চিমবঙ্গে মনসা পূজা করা হয় শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি তিথিতে। কিন্তু রাজবংশীরা সারা ভাদ্র মাস ধরে ভগবতী বিষহরির পূজা করে। বিষহরা গানের মধ্য দিয়ে। বিষহরিকে দুধ-কলা ও অন্যান্য প্রসাদ দিয়ে পূজা দিয়ে থাকে। আবার শুধু ঢাকের বাজনা দিয়েও পূজা দেওয়া হয়। তবে এই অনুষ্ঠান শুধু এক দিনের জন্য করা হয়। বাড়িতে মনসার থান (মাটির বেদি) ও ঠগা (বাঁশের নির্মিত প্রদীপ দেওয়ার স্থান) করেও নিত্য পূজা এবং ভাদ্র মাসে দুধকলা দিয়ে পূজা দেওয়া হয়। কিন্তু মাড়াই পূজা ও

পালাগান সাধারণতঃ তিন দিন ব্যাপী হয় অবশ্য মাড়েয়া (মালিক) তাঁর সামর্থ্য অনুযায়ী পাঁচ দিন অথবা সাত দিন ধরেও করতে পারেন।

ছেলের বিয়ের ক্ষেত্রে মাড়াই পূজার জন্য বিয়ের আগের দিন অর্থাৎ অধিবাসের দিন বিষহরির ঘট বসে, বিয়ের দিন নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের পর বর বিয়ে করতে যায়। রাত্রে মাড়াই পূজা ও গান চলতে থাকে। সকাল পর্যন্ত গান হয়। বর কনে বিয়ের পরে সকালের দিকে বাড়ি ফিরে এসে বিষহরি পূজা করে আশীর্বাদ নেয়।

শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে এই পূজা সর্বাধিক হয়ে থাকে। তবে বছরের অন্য যেকোনো দিনে অন্নপ্রাশন, বিয়ের সময় অথবা বছরের যে কোন শুভ দিন দেখে এই পূজা করা হয়ে থাকে।

মাড়াই মূর্তির বর্ণনা: দেবী মনসারই আর এক রূপ উত্তরবঙ্গে মাড়াই নামে পরিচিত। মনসা মূর্তিতে শুধু সর্পশোভিত হংসবাহনা মনসাকেই পূজা করা হয় আর মাড়াই পূজায় মনসার সঙ্গে তার পুরো পরিবারকে একসঙ্গে রূপ দিয়ে পূজা দেওয়া হয়। এই মাড়াই পূজায় মূর্তির চালচিত্র তৈরি করে পূজা করা হয়। মাড়াই মূর্তির সবার উপরে থাকে শিব পার্বতীর মূর্তি বা চিত্র। শিব পার্বতী বা শিব মূর্তি মনসার মূর্তির ওপরে মাথার ডানপাশে থাকে আবার কোথাও কোথাও শিব পার্বতীকে অথবা শুধু শিবকে আলাদা করে পূজা করে মাড়াই মূর্তির সঙ্গে রেখে দেওয়া হয়। পদ্মার পিতা মাতা হিসাবে শিব পার্বতীকে দেবীর মাথার উপরে স্থান দেওয়া হয়। তারপরে সর্পশোভিত হংসবাহনা বিষহরির বা মনসার মূর্তি বড় করে তৈরি করা হয়। বিষহরি মূর্তির ডানপাশে থাকে পেচক বাহনা লক্ষ্মীর মূর্তি, বামপাশে থাকে হংসাসীণা সরস্বতী। তাদের নীচের পংক্তিতে ডানদিকে থাকে মূষিক বাহন গণেশ ও বামদিকে ময়ূরাসীন কার্ত্তিক মূর্তি। চালচিত্রের বাইরে মূর্তিগুলির বামপাশে রাখা হয় ভেলায় ভাসানো সাদা কাপড়ে ঢাকা মৃত লখিন্দরের মূর্তি ও পাশে উপবিষ্টা শোকাকুলা বেহুলার মূর্তি। ভেলায় ভাসানোর বিষয়টি আবশ্যিক নয়। ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করা হয়। আবার কোথাও বেহুলা লখিন্দরের হাত জোর করে দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে আশীর্বাদ নেওয়ার মূর্তি রাখা হয়। সঙ্গে ডানপাশে গোদা ও গোদির মূর্তিও রাখা হয়। গোদা-গোদি মৎস্য দেবতা। পদ্মাপুরাণের কাহিনির সঙ্গে মিল রেখে গোদা-গোদি মূর্তি রাখা হয়। মৃত স্বামীকে নিয়ে বেহুলা নদীতে ভেলায় ভেসে যাওয়ার সময় গোদার ঘাটে নদীর মাছেরা লখিন্দরকে খেতে চাইলে মৎস্য দেবতা গোদা-গোদি এসে সতী বেহুলাকে নির্ভয়ে স্বর্গে যাওয়ার আশীর্বাদ দেয়। তাই এই মূর্তিও দেবীর সঙ্গে রেখে দেওয়া হয়। সমগ্র চালচিত্রটি ঠাকুর ঘরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। শিব পার্বতীর অবস্থান মানে একদিকে পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা আর একদিকে মহাশক্তির কাছে আনুগত্য প্রদর্শন করা। লক্ষ্মী সরস্বতী সম্পদ ও জ্ঞানের প্রতীক, গণেশ সিদ্ধিশক্তি দাতা, কার্ত্তিকের সৌন্দর্য ও বীরত্বেরর ভাবনা এখানে যুক্ত হয়েছে। আবার ভাই বোনের প্রীতি মিলন সংসারে সুখ সমৃদ্ধির বার্তা বহন করে। পূজানুষ্ঠানটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্য ঠাকুর ঘরের বারান্দায় ডাইনে বায়ে দুটি পূজাপ্রহরী বা পূজারিণীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বারান্দার নিচে ঠাকুর ঘরের দরজার সামনে দুই দিকে দুটি কলাগাছ পোঁতা হয়। কলাগাছ মঙ্গলের প্রতীক। গোটা পূজা মন্ডপটিকে চাঁদোয়া দিয়ে ঢেকে রাখা হয়।

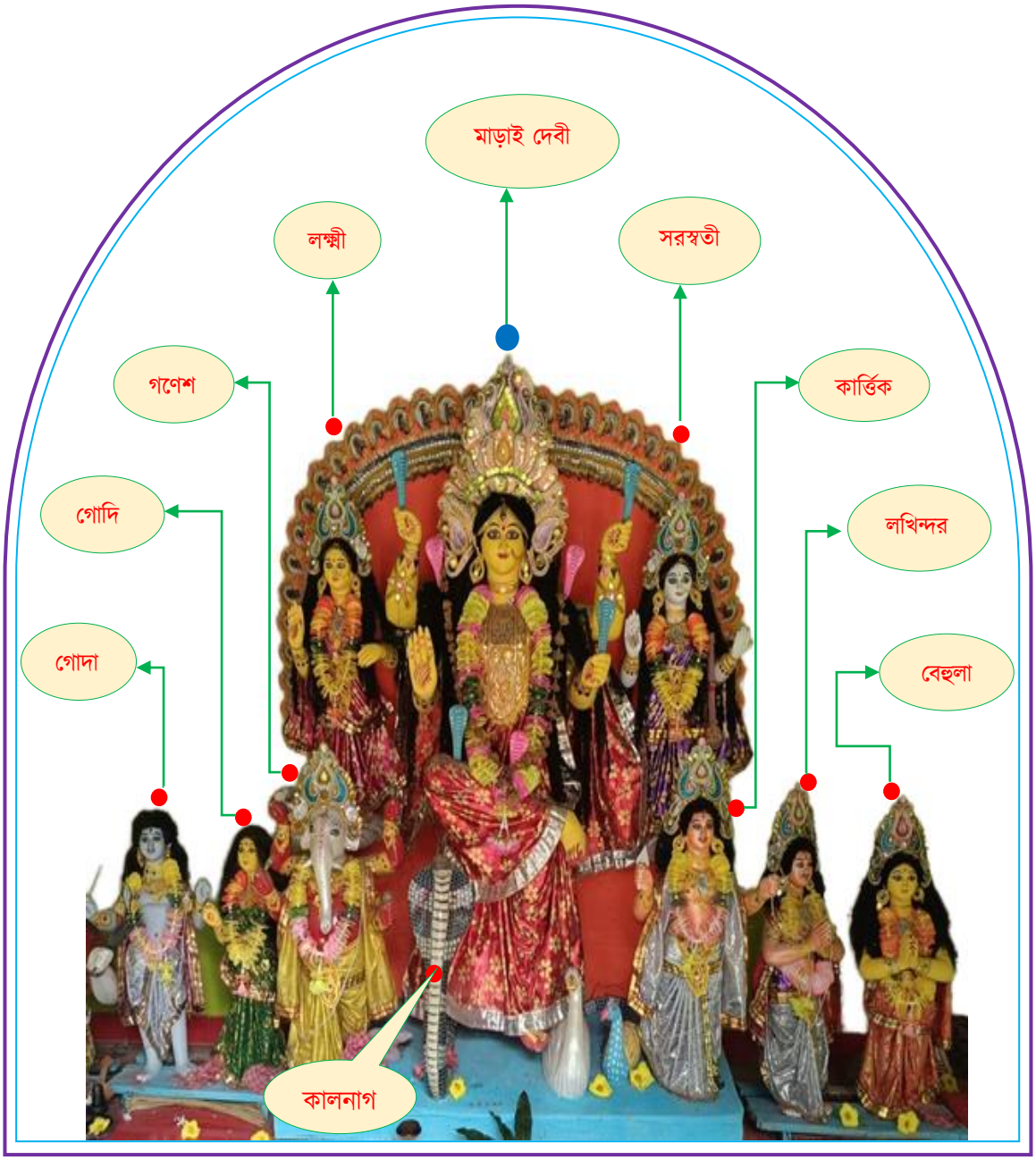

চিত্র ২. মাড়াই মূর্তির রূপ বর্ণনা

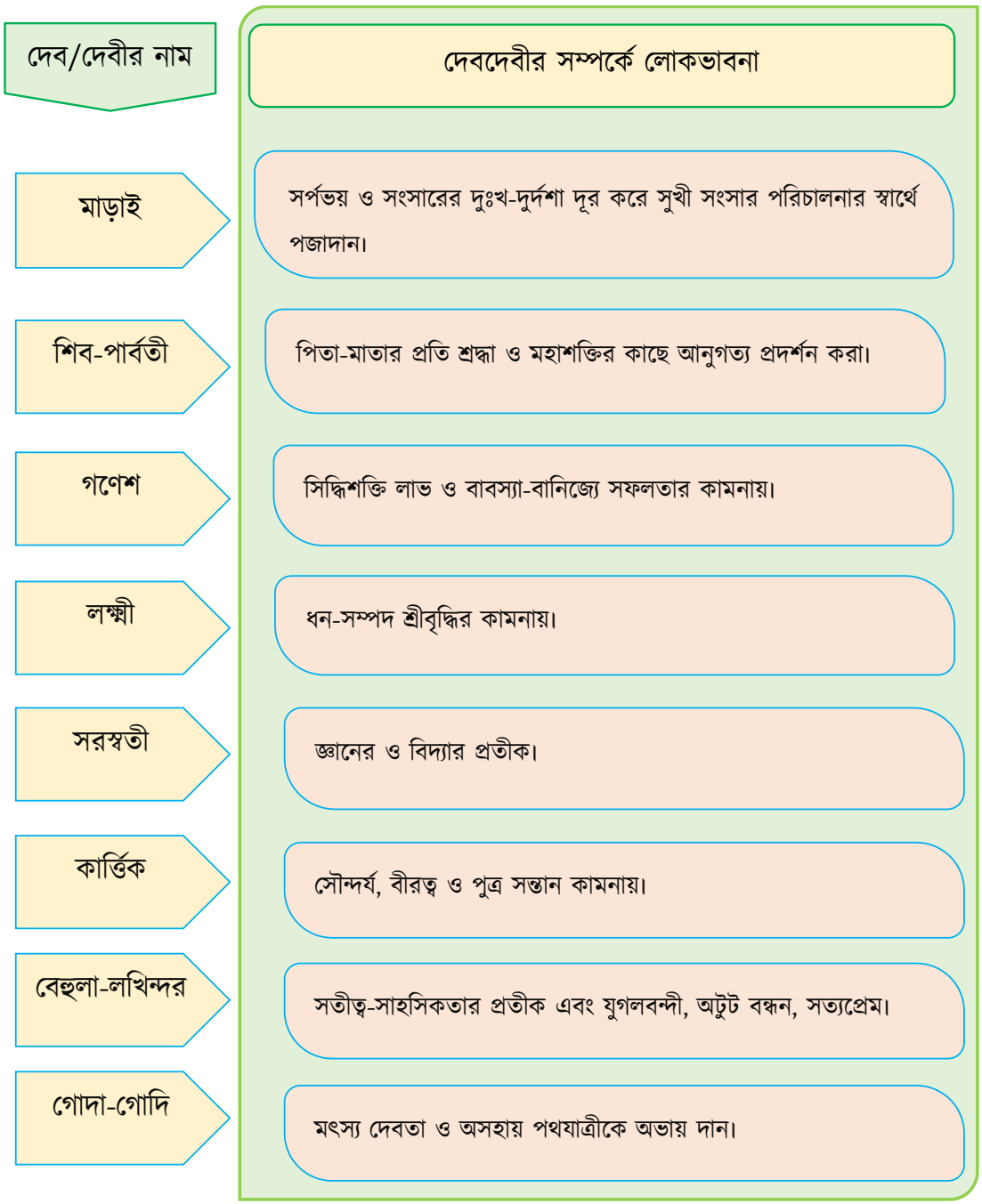

চিত্র ৩. মাড়াই দেবী সম্পর্কিত লোকভাবনার প্রবাহচিত্র (Flowchart)

মাড়াই পূজার লোকাচার এবং পালাগান

মাড়াই পূজারীতি ও বিষহরা দলের পালাগান: মাড়াই পূজার দায়িত্বে থাকেন একজন ব্রাহ্মণ। বিষহরি, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গণেশ, কার্ত্তিকের জন্য একটি করে ঘট স্থাপন করা হয়। ঘটের উপরে দেওয়া হয় ডাব, ঘটের নীচে ধান, দূর্বা দিয়ে ঘট বসানো হয়। ঘটের সামনে কলার নেইজ পাতা (কলাপাতার আগা অংশ) মাটিতে পাতা হয়। নেইজ পাতায় সিঁদূর মাখানো এক ঝুঁকি মালভোগ বা মনুয়া কলা রাখা হয ও কেটে রাখা কিছু ফল দেওয়া হয়, একসঙ্গে এটিকে বলা হয় 'থাতি' বা 'থাইত'। থাতি কলাগাছ দুটির সামনেও দেওয়া হয়। থাতিতে ফুল, দূর্বা, তুলসিপাতা, বেলপাতা দিয়ে পূজা দেওয়া হয়। প্রথমে শিব পার্বতীর পূজা করা হয়। পরে অন্যান্য দেবতা সহ নারায়ণেরও পূজা করা হয়। বিষহরির পূজা শুরু হয় সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজার মধ্য দিয়ে। ব্রাহ্মণ এই পঞ্চ দেবদেবী (বিষহরি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্ত্তিক) চক্ষু দান ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। এতে প্রয়োজনীয় মন্ত্রপাঠ হয়। একে একে এদের সকলের পূজা হয়।

এই পূজার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিষহরা গানের দল তাঁর ভূমিকা পালন করে যান। মাড়েয়ার (যার বাড়িতে পূজা হচ্ছে) বাড়ির আঙিনায় বসে গানের থলা (আসর)। এই গানের থলায় শ্রোতাও জুটে যায় প্রচুর। গানের থলার সামনে চামর, খোল, করতাল, কূপা বাঁশি রেখে মায়ের দিকে মুখ করে প্রণাম করে গীদালরা। তারপর যন্ত্র সহযোগে গানে যোগদান করে। গানের দলের মূল গায়েনের ডানহাতে সারাক্ষণ একটি কালো রঙয়ের 'চঙর' অর্থাৎ চামর থাকে। মূল প্রথমে বসে মাতৃ বন্দনা করে। পরে সৃষ্টিতত্ত্ব গানে তুলে ধরেন। মূল আগে আগে সৃষ্টিতত্ত্ব গানের মাধ্যমে বলেন, তাঁর সঙ্গে ধুয়া বা ধ্রুবপদ দুজন দোহার বা চার পাঁচ জন গেয়ে যান। জলময় পৃথিবীতে স্বয়ং বিষ্ণু কিভাবে অসুর মধু ও কৈটভকে হত্যা করে, মৃত্তিকা সম্বলিত পৃথিবী সৃষ্টি করলেন তার বর্ণনা দেওয়া হয়। গীদাল গানের মধ্য দিয়ে মাটি সৃষ্টি করেন, সেই মাটি দিয়ে ঘট সৃষ্টি হয়। এরপরে শিব পার্বতীর বিয়ে, গনেশ, কার্ত্তিকের জন্ম কথা আগে, পরে লক্ষ্মী-সরস্বতীর জন্ম বৃত্তান্ত বলা হয়। বিষহরির বা মনসার জন্ম কাহিনি বর্ণনা করে কৃপা ভিক্ষা করা হয়। ব্রাহ্মণ বিষহরির মহাস্নান করান গঙ্গাজল, ঘৃত, মধু, অষ্ট মৃত্তিকা, দই, দুধ ও সোনা-রূপার স্পর্শের জল দিয়ে। সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। পঞ্চ ঘটস্থিত দেব-দেবীর পূজা সেরে ব্রাহ্মণ অষ্টনাগের পূজা করেন। শেষে হোম (যজ্ঞ) করা হয়।

এরপর গীদালরা পালাগান শুরু করেন। গীদালরা এক একজন এক একটি চরিত্রে অভিনয় করে পুরো কাহিনিটি পালাগানের মাধ্যমে পরিবেশন করেন। প্রথমে চামরধারী মূল (দলের প্রধান), দোয়ারী (ভাঁড়) ও নর্তকী (ছোকরা) একসঙ্গে দাঁড়ায়। সঙ্গে অন্য পালীরা (অন্যান্য গীদাল) দাঁড়িয়ে যন্ত্র নিয়ে মহড়া শুরু করে। জোড়া খোল, জোড়া কূপা বাঁশি, জোড়া করতাল বা জুড়ি বাজানো হয়। পালীদের ঘেরাও করে মূল, দোয়ারী চলে ও সঙ্গে নর্তকীদের নাচ চলে। ঘুরে ঘুরে নাচগান চলতে থাকে। স্বর্গের দেবসভায় নৃত্যের তাল ভঙ্গজনিত অপরাধে ঊষা ও অনিরুদ্ধকে ইন্দ্র মর্ত্যে পাঠিয়ে দেন। ফলস্বরূপ ঊষা সাহ রাজার মতান্তরে বাছর বানীয়ার ঘরে তাঁর কন্যা বেহুলা নামে জন্মগ্রহণ করেন। অন্যদিকে চাঁদ সদাগরের পুত্র রূপে অনিরুদ্ধ জন্ম নেন। নাম হয় লখিন্দর বা লখাই। বিষহরি শিবভক্ত চাঁদ সদাগরের থেকে পূজা চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হন। বিষহরি ক্রুদ্ধ হয়ে চাঁদ সদাগরের ছয় পুত্রের সর্প দংশনে প্রাণ নেন। সদাগরের সপ্তডিঙা নদীতে ডুবিয়ে দেন। বেহুলা লখিন্দরের বিবাহের সময় দেবী বিষহরি আবার পূজা দাবী করেন, এবারেও সাদাগর অপমানিত করে 'চ্যাংমুড়ি কানী বিষহরি' বলে তাড়িয়ে দেন। বিষহরি লখিন্দরকে সর্প দংশনে

মেরে ফেলার হুমকি দেন। চাঁদ সদাগর লোহার নিছিদ্র বাসর ঘর তৈরি করেন বিশ্বকর্মাকে দিয়ে। কিন্তু বিষহরি বা পদ্মার ইঙ্গিতে বিশ্বকর্মা লোহার বাসর ঘরে ছিদ্র রাখতে বাধ্য হন। যথাসময়ে বিয়ের রাতে বাসর ঘরে পদ্মার পাঠানো সর্প কালনাগ লখাইকে মেরে বেরিয়ে আসে। বাসর ঘরের এই হৃদয় বিগলিত দুঃখের ঘটনাকে গীদালরা 'মেন্ড করুণা' নাম দিয়ে ঘাট করায় অর্থাৎ অভিনয় করায়। বেহুলা সনকার বিলাপ, শোকাহত চাঁদ সদাগরের পুত্রকে সৎকারের ঘোষণা সব মিলিয়ে করুণ রসায়িত আবহ সৃষ্টি করে। এরপর ভেলায় মৃত স্বামীকে নিয়ে বেহুলার নদীপথে গমন, অষ্টমায়ার ছলনায় পড়া, গোদার ঘাট পার হয়ে ভাই শঙ্কাই বঙ্কাই এর সঙ্গে দেখা হওয়া, পরিচয়-বিলাপ প্রভৃতি ঘটনা মা পদ্মার কৃপায় পেরিয়ে যান বেহুলা। এরপরে অবশেষে জলে ভাসতে ভাসতে ধোপানীর ঘাটে মহাদেবের কন্যা নেতার সাক্ষাৎ লাভ এবং নেতার সহযোগিতায় মৃত স্বামীর দেহ নিয়ে স্বর্গে পৌঁছান বেহুলা। সেখানে বেহুলা মহাদেব সহ অন্যান্য দেবতাদের নাচ দেখিয়ে সন্তুষ্ট করেন। মহাদেবের আদেশে মর্ত্যে পূজা পাওয়ার জন্য পদ্মা অবশেষে লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দেন। বেহুলা প্রতিশ্রুতি দেন পদ্মাকে যে, সে তাঁর শ্বশুর চাঁদ সদাগরকে দিয়ে পূজা দেওয়াবেন। জীবিত স্বামীকে নিয়ে বেহুলা মর্ত্যলোকে ফিরে আসেন। পুত্রবধূ বেহুলার অসাধ্য সাধনে ও বেহুলার বিশেষ অনুরোধে চাঁদ সদাগর বাম হাতে পূজা দেন। হারানো সব সম্পদ ফিরে পান চাঁদ সদাগর। বিষহরির পূজাও চালু হয় পৃথিবীতে। চাঁদ সদাগরের এই প্রবর্তিত পূজাই করে আসছে রাজবংশীরা।

মাড়াই পূজা সাধারণত তিন দিন ব্যাপী হয়। মাড়েয়া তাঁর সামর্থ্য অনুযায়ী পাঁচ দিন অথবা সাত দিন ধরেও করতে পারেন। ছেলের বিয়ের ক্ষেত্রে বিয়ের আগের দিন অর্থাৎ অধিবাসের দিন বিষহরির ঘট বসে। বিয়ের দিন নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের পর বর বিয়ে করতে যায়। সারা রাত ধরে মাড়াই পূজা ও গান চলতে থাকে। গানের আসরে শ্রোতাও হয় অনেক। বর-কনে বিয়ের পরে সকালের দিকে বাড়ি ফিরে আসে। যাঁদের বাসি বিয়ের রীতি আছে তাঁদের বাড়িতে সকালে বাসি বিয়ে হয়ে গেলে বর-কনে বিষহরি পূজা করে। অন্যথায় বিয়ের পরদিন সকালে বর-কনে বিষহরি পূজা করে। বর-কনে হাঁটু গেড়ে বসে, কনে খোলা চুলে থাকে। প্রথমে দুজনে একসঙ্গে বাঁ হাতে ফুল দেয়। পরে একসঙ্গে ডান হাতে ফুল দেয় দেবী বিষহরিকে। এইভাবে পূজা শেষ করেন বর-কনে। মূল আরো গান গাইয়ে পালাগানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এরপর 'ঘট ঘর করা' অনুষ্ঠান হয়। বর-কনে ও বাড়ির অন্য সকলে মিলে পূজার 'থাতি' ও অন্যান্য উপকরণ মাথায় নিয়ে একে একে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। পিছনে গীদালের দল গান ও নাচ করতে করতে সকলে চলে।

এইভাবে গানের মাধমে ঘটসহ 'থাতি' মাথায় নিয়ে বর-কনে বাসর ঘরের দিকে যায়। বাসর ঘরে ঢোকার আগে ঘরের চালে জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। সেই জলের স্পর্শ নিয়ে বর কনে ঘরে যায় এবং 'থাতি' হর-গৌরীর স্থানে রাখে। সবাই একই ভাবে ঘরে ঢোকে ও উপকরণগুলি রাখে। এই ভাবেই পূর্ণ মাড়াই পূজা সাঙ্গ হয়।

সমীক্ষা ভিত্তিক কিছু সুচিন্তিত ভাবনা বা পরামর্শ: উপরিউক্ত মাড়াই পূজার রীতিনীতি, লোকাচার ও লোকগীতি আলোচনা করার পর পরিশেষে নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, মাড়াই পূজা আজ অবলুপ্তির পথে। বিশেষ করে এই লোকগান ও বিষহরা দল। উপরের তথ্য ও ক্ষেত্র তথ্য সংগ্রহের ভিত্তিতে এই পূজার ও লোকগানের দল কেন্দ্রিক কিছু পরামর্শ নীচে বর্ণনা করা হল ----

মাড়াই পূজা সংক্রান্ত

ক. আপন সংস্কৃতির মানুষের দায়বদ্ধতার অভাবঃ যে কোন সংস্কৃতির ঐতিহ্য, পরম্পরা, পূজার্চনা, রীতিনীতি, লোকাচার ধরে রাখার দায়িত্বও সেই সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষজনের। অতএব এই মাড়াই পূজার বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব আমাদেরই অর্থাৎ রাজবংশীদেরই। রাজবংশী সমাজের প্রত্যেক মানুষের মাড়াই পূজার প্রতি ভক্তিবোধ, শ্রদ্ধাবোধ, দেবীর আশীর্বাদ, মঙ্গল প্রার্থনা, সর্পভয় মুক্তি, কামনা-বাসনা অটুট রাখার দায়িত্ব রাজবংশীদেরই। পুরনো দিনের মানুষজন বা বয়স্ক মানুষরা যেভাবে এই পূজার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি ভালোবাসা দিয়ে পূজার্চনা করে নিজেদের কামনা-বাসনা ও আমোদ-প্রমোদ করতো আজও এসব বজায় রাখতে হবে। পূজার্চনা করে পরিবারের সকলের মঙ্গল কামনা ও সকলে মিলে আনন্দ উপভোগ এসবে রাজবংশী সমাজের প্রত্যেক মানুষকেই অংশগ্রহণ করতে হবে এবং কাঁধ মেলাতে হবে। তার জন্য প্রত্যেক মানুষের মূল্যবোধ বজায় রাখতে হবে।

খ. দেবীর অস্তিত্ব বিশ্বাসে বিরূপ মানসিকতাঃ এই মাড়াই পূজা বর্তমানে কেবলমাত্র তাঁদের বাড়িতে পাওয়া যায় যারা পূর্ববর্তী সময়ে কোন না কোন ভাবে কামনা বাসনার দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। তাঁরাই এই পূজার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা অটুট রেখেছেন। তবে এই পূজা সংক্রান্ত রীতিনীতি ও মাড়াই পূজার মাহাত্ম্য মানুষজন জানতে পারে গানের মাধ্যমে বা বিষহরা দলের পালাগানের মাধ্যমে। তবে আজ এই বিষহরা গানের দল যেমন হারিয়ে যাচ্ছে, তেমনি মানুষও মাড়াই সম্বন্ধে জানতে পারছে খুব কম পরিমাণে। অন্যদিকে পুরনো রাজবংশী বাড়িতে যাঁরা মাড়াই পূজা নিত্য করতেন তাঁরা বা তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম এই পূজা আর ধরে রাখছেন না।

গ. বিশ্বায়নের প্রভাবঃ বর্তমান প্রজন্মের মানুষজন উন্নত প্রযুক্তির অনেক সুবিধার ফলে, দেব দেবীর সম্পর্কে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। মানুষজন এখন পাশ্চাত্যমুখি, নিজেদের সংস্কৃতিকে ভুলতে বসেছে। ফলে নিজেদের লৌকিক দেবদেবী সম্পর্কে আস্থাহীনতা বেড়েই যাচ্ছে।

বিষহরা গানের দল সংক্রান্তঃ আগেরকার দিনে বিষহরা গানের যে জনপ্রিয়তা ছিল তা আজ আর নেই। এর কতগুলি কারণ হল – আধুনিকতার অভাব, দলের লোকের অভাব, মানুষের গানের প্রতি শ্রদ্ধা বা টানের অভাব, একই কাহিনি, একই মঞ্চ, একই উপস্থাপনার ফলে একঘেয়েমি অর্থাৎ নতুনত্বের অভাব। এইসব কারনের অধিকাংশেরই অধিকারী আমরা নিজেরাই। এসব কারণকে উপড়ে ফেলতে হলে আমাদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। বর্তমান সময়ে এসে বিষহরা দল নানান সমস্যায় জর্জরিত। তবে এর হাত থেকে রক্ষা পেতে নিম্নে কতগুলি সমাধানের চাবিকাঠি উল্লেখ করা হল-

ক. সদস্য সংখ্যা ক্রমশ্য হ্রাসঃ বিষহরা গানের দলের সদস্য ক্রমহ্রাসমান। কেননা এই গানের দলের নতুন সদস্য নেই বললেই চলে। কেবল যারা বংশপরম্পরায় এই গানের সদস্য তাদেরই কেবল এই দলের সাথে যুক্ত থাকার প্রবণতা বেশি। অন্যথায় নতুন কেউ যোগদান প্রদানে অনীহা প্রকাশ করে থাকে। তবে এর হাত থেকে বাঁচতে হলে রাজবংশী সমাজের শৌখিন ও ইচ্ছাকৃত ভাবে যোগ দেওয়া নতুন সদস্যদের বিষহরা গানকে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা করতে হবে। আরো নতুন যুব প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে।

খ. উপযুক্ত লেখনী ও প্রশিক্ষণের অভাবঃ আধুনিকতার অভাব কেবল গানের দলের বাদ্যযন্ত্র, মঞ্চসজ্জায় ও উপস্থাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। গানের দলের অভিনেতাদের অভিনয় দক্ষতার মধ্যেও রয়েছে। এই দলের অভিনেতাদের অভিনয় দক্ষতা যেমন বাড়াতে হবে কেননা এই দলে কেউ অভিনয় প্রশিক্ষণ নিয়ে আসে না। মনের খেয়ালে বা শখে বা আনন্দ লাভের জন্য অথবা বংশপরম্পরায় যুক্ত হয়। তেমনি

লোকগানকে মানুষের আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য নতুন করে কাহিনি বিন্যাস বজায় রেখে পালা গান লিখতে হবে বর্তমানের প্রাসঙ্গিকতার দিকে নজর দিয়ে।

গ. সুবিধাভোগী মনভাবঃ বর্তমানে নতুনভাবে বিষহরা গানের দলের সদস্যরা পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত শিল্পী ভাতা প্রকল্পের অধীনে কিছু আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকেন। তবে এই ভাতার যেমন ইতিবাচক দিক আছে তেমনি এর নেতিবাচক দিকও রয়েছে। ইতিবাচক দিক হিসাবে গানের সদস্যদের নিজেদের জীবনের নির্দিষ্ট অংশ সচ্ছল হলেও তাঁদের মধ্যে অন্তর্নিহিত ভাবে কোথাও না কোথাও গানের দলে যোগদানের প্রতি অনীহা বা যোগদানের হার কমে এসেছে। ফলে ভাতার অধীনে সদস্যগণ প্রধানত বয়সের কারণে, চিকিৎসাজনিত কারণে, পারিবারিক কারণে বিষহরা গানের দলের থেকে বিরত থাকছেন। তাই এগুলি থেকে রক্ষা পেতে সার্বিক বিকাশ দরকার।

ঘ. অন্যান্য কারণঃ অনান্য কারণ হিসাবে বিষহরা দলকে সরকারীভাবে নথিভুক্ত করণ, সার্বজনীন স্তরে মান্যতার মাধ্যমে সার্বিক উন্নতি। অন্যদিকে আধুনিকতার সাথে তাল মিলিয়ে গান/লোকগান বা পালাটিকে সম্পূর্ণরূপে আধুনিকীকরণের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে জনসংযোগের মাধ্যম হিসাবে তুলে ধরতে হবে। যাতে মানুষজন পরবর্তী সময়ে বিষহরা গানের দলে যোগদান বা গান শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করে।

পরিশেষে না বললেই নয়, বর্তমানে রাজবংশী সমাজে অর্থনৈতিক ব্যাবস্থার আমূল পরিমাণে মানসিকতার বদল ঘটেছে। কেননা পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে বিষহরা গান যেমন পাঁচ বা সাত দিন ধরে জাঁকজমক করে করা হত। এখন তা কমে এক দিন বা বেশী হলে তিন দিনে সীমাবদ্ধ হয়েছে। এই বিষহরা গানের দিন সংখ্যা হ্রাসের একমাত্র কারণ হল অর্থনৈতিক সংকট। আর এই অর্থনৈতিক সংকটের পিছনে কারণগুলি হল- মানসিকতার সংকীর্ণতা, দলের প্রতি বা গানের প্রতি অনীহা প্রকাশ, মাড়াই পূজার আধিক্য হ্রাস, দৈবক্ষমতায় বিশ্বাস কমে যাওয়া ইত্যাদি। তবে এই জর্জরিত আর্থিক সংকট থেকে সমাধানের জন্য রাজবংশীদেরই এগিয়ে আসতে হবে এবং এই দলের অবস্থান রাজবংশী সমাজে আবার আগের মতো ফিরিয়ে আনতে হবে।

উপসংহার: উপরিউক্ত প্রেক্ষিত থেকে আমরা একথা বলতে পারি যে, আমাদের প্রত্যেক রাজবংশীকেই দায়িত্ববোধের মাধ্যমে মাড়াই পূজার সামগ্রিক রূপকে অটুটভাবে বজায় রাখতে হবে। এর জন্য সামাজিক স্তরে প্রত্যেক মানুষকে জনসংযোগের মাধ্যমে প্রচার করতে হবে এবং নিজ ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে। ঐতিহ্য বিলুপ্তি মানে নিজেদেরও বিলুপ্তি। মাড়াই পূজার সাথে জড়িত বিষহরার গানকে যেমন বজায় রাখতে হবে তেমনি এই গানের মাধ্যমে মাড়াই পূজার মাহাত্ম্য রাজবংশী সমাজের মানুষজন জানতে পারবে যে এই পূজা আমাদেরই সমাজের অংশ, তাই সংরক্ষণের জন্য আমাদের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য মাড়াই পূজার পরম্পরা একই হারে বজায় রাখতে হবে।

পরিশিষ্ট

সাক্ষাৎকারঃ

বিষহরা দলের মূল গীদালী ননিবালা বর্মনের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার –
(সাক্ষাৎকারটি তিনি রাজবংশী ভাষাতে দিয়েছেন)

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার এই বিষহরা গানে যোগদান কোন সময় থেকে?

উত্তরদাতাঃ আমার বসয় যখন প্রায় ৩৫-৪০ তখন আমি এই গানের সাথে যুক্ত হই। তা আজ থেকে প্রায় ৭০ সাল আগে ১৯৬৫-৭০ সালের কথা। আজ আমার বয়স ৯৫।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি এখনও কি বিষহরা দলের গান করছেন না ছেড়ে দিয়েছেন?

উত্তরদাতাঃ আমার এই বয়সের কারণে এখন শরীর খুব ভাল যাচ্ছে না। তাই আমি এখন এই দল থেকে বিরত আছি। আমার ছেলে ও দলের সবাই করছে। তবে বাড়ির কাছাকাছি হলে এখনো অংশগ্রহণ করি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার বিষহরা গানে আসা কিভাবে?

উত্তরদাতাঃ মায়ের কৃপায় গানে যোগ দেওয়া, কিছুটা আবার শখে আগে শুধু ঢাক দিয়েই তিন দিন সাত দিন গান করে বেড়িয়েছি চাপান সুরে। এভাবে ১৩ বছর গান করার পরে দল গড়া, সেই দল এখনো চলছে।

প্রশ্নকর্তাঃ গান শিক্ষা কার কাছে কিভাবে?

উত্তরদাতাঃ আমার গানের গুরু বা শিক্ষক কেউ নেই। মা পদ্মার প্রচলিত কাহিনি আমরা ছোটবেলায় মুখে মুখে শুনে শুনে বড় হয়েছি। পরে গানের মাধম্যে মার মাহাত্ম্য গেয়ে বেড়ানো ও মুখে মুখে গান বানিয়ে গাওয়া। পরে আমার ছেলে আমার থেকে শুনে খাতায় তুলে নিয়েছে। এখন ওরা ওই গানই গায়।

প্রশ্নকর্তাঃ একজন মেয়ে মানুষ হয়ে সংসার সামলে গান করা কতটা কঠিন/সহজ ছিল?
উত্তরদাতাঃ গানের টানে সংসার কিছুই না, সংসার ছেলে মেয়ে চলবে একভাবে। কিন্তু গানের ডাক আসলে যেতেই হত। গানের বায়না/বানকা নেওয়া হলে, সব ফেলে ঢাকির বাড়িতে সকালের গাড়িতে দৌড়ানো এসবও করেছি একসময়। সংসার তুচ্ছ মায়ের কাছে। মায়ের গুনগান গেয়ে বেড়ানো কি সবার জন্য! গানের আসরটাই আমার আসল সংসার। আর মেয়ে কি ছেলে কোনোদিন মনেও হয়নি সেকথা, তবে আমার চলার পথ তো সত্য ছিল তাই মায়ের দয়ায় এখনো ৯৫ বছর বয়েসেও সচল, এখনো মার মাহাত্ম্য তোমাদের শোনাতে সক্ষম।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনারা কোন কোন জেলায় এই বিষহরা গান করেছেন?

উত্তরদাতাঃ কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আসামে গান করতে গিয়েছি। এমনকি উত্তর-দক্ষিণ দিনাজপুর ও বিহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও গান করে এসেছি।

প্রশ্নকর্তাঃ একদিনের মনসা পূজার গানের সাথে পাঁচ বা সাত দিনের মাড়াই পূজার গানের পার্থক্য কোথায়?

উত্তরদাতাঃ এক রাত্রের মনসা মায়ের গানে সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে মনসার মর্ত্যে আগমন পর্যন্ত পুরো পালাগান সংক্ষিপ্ত ভাবে সব কাহিনি শুধু ছুঁয়ে যাওয়া হয়। আর মাড়াই দেবীর গানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি বা জলময় পৃথিবীতে মাটি তৈরি করতে এবং সব দেব দেবীর বন্দনা করতে এক দিন। আস্তে আস্তে পুরো কাহিনি এভাবে সাত দিন ধরে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পালাগানে পরিবেশন করি।

প্রশ্নকর্তাঃ বিষহরা গান কি শুধু রাজবংশীরাই ডাকেন নাকি অন্য জাতির মানুষরাও ডাকেন?

উত্তরদাতাঃ শুধু রাজবংশীরাই নয় এখানকার স্থানীয় মানুষ সকেলেই ডাকেন। সে জেলে, তাঁতি, কায়স্থ যিনিই হন, এমনকি মুসলমানের বাড়িতেও গান করে এসেছি। মা মনসা তো মর্ত্যে নেমে প্রথম হাসান হোসেন দুই ভাইয়ের কাছে পূজা নেন।

প্রশ্নকর্তাঃ বিষহরা গান আপনাদের কোন কোন মাসে করতে হয়?

উত্তরদাতাঃ এখানকার মানুষ সারা বছর ধরেই যেহেতু মনসা পূজা করে, ছেলের বিয়ে, বাচ্চার মুখে ভাত দেয় তাই গান বারোমাসেই করতে হয়। তবে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের বায়না/বানকা(ডাক) বেশি আসে।

প্রশ্নকর্তাঃ গানের বায়না এখনো আগের মত আসে না কমে এসেছে বর্তমানে?

উত্তরদাতাঃ এখনো আগের মতই এখানকার মানুষ গানে আগ্রহ দেখায়। তবে এক রাত্রের গানই বেশি হয়, মাড়াই গান যে তিন দিন, পাঁচ দিন বা সাত দিন ধরে করেছি এখন সেটা কমে এসেছে। একমাত্র পুরনো বাড়ির যে বাপ ঠাকুরদারা আগের থেকেই বিষহরা গান দিয়ে এসেছেন, তাঁরাই এখনো পাঁচ-সাত দিনের মাড়াই পূজার গানে ডাকেন।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি আগে যেভাবে গান করতেন বর্তমানেও কি সেভাবে করেন না পরিবেশনে বদল আনতে হয়েছে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ, এখন গানে অনেক নতুনত্ব আনতে হয়েছে। অনেক রঙ চং আনতে হয়েছে পোশাকে, মঞ্চসজ্জায়, কাহিনি বিন্যাসে। আগে এই বিষহরা গানে একজন মূল গায়েন ও দোহার থাকত। সঙ্গেত থাকত দুজন খাপী বাদক এবং দুজন মুখা বাঁশিবাদক। এই মুখা বাঁশির বৈশিষ্ট্য হল পালাগানটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটানা ভাবে অনেকটা সাপ খেলানোর ভঙ্গিতে বাজিয়ে চলা। এই গানকে আবার তাই বাঁশি পুরাণও বলা হয়। আবার কখনো কখনো ঢাক ও কানাট, ফুলট বাঁশিতেই গান চালাতাম। এখন অনেক নতুন বাদ্য যন্ত্র যোগ করতে হয়েছে। মাইকের অনেক সুবিধা যোগ হয়েছে। পালা গান এখন যাত্রার ঢঙে অভিনেতারা মঞ্চে গিয়ে অভিনয় করে। হাস্য রসের জন্য আলাদা দোয়ারী (ভাঁড়) রাখতে হয়েছে।

প্রশ্নকর্তাঃ বর্তমানের শ্রোতার কাছে গানের গুরুত্ব কি কমে এসেছে না এখনো আগের মত সমান শ্রোতা আসে গান শুনতে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ, গান শুনতে এখনো মানুষ আসে। তবে গানে অনেক নতুনত্ব আনতে হয়েছে। অনেক রঙ চং আনতে হয়েছে সবেতেই। তবে এই গানের শ্রোতা বয়স্ক গৃহস্থ মানুষরাই বেশি, ছেলে ছোকরারা তেমন আসে না গান শুনতে।

প্রশ্নকর্তাঃ নতুন প্রজন্ম কী এই গান শিখতে আগ্রহ দেখাচ্ছে বা শিখেছে কেউ?

উত্তরদাতাঃ নতুন দল আমার থেকে শিখে নয়টি দল বানিয়েছে। নতুনরা এখন অনেকেই আমার বা অন্য কারও অনুপ্রেরণায় দল তৈরি করে বিষহরা গান করে। তবে দলে গীদালের অভাব তো সারাবছরই থাকে। কিছু মানুষ তো গানের টানে দলে থেকে যায়। কিন্তু ছেলে ছোকরারা দল ছেড়ে যায় আবার আসে, টাকা রোজগারের সুবিধা পেলে অন্য কাজে হোক বা বিদেশে হোক চলে যায়। তখন কয়েকজনকে নিয়ে আমাদেরকেই গান সাধ্যমত বাঁচিয়ে রাখতে হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ বর্তমান সময়ে এই বিষহরা গানকে বাঁচিয়ে রাখতে কী করণীয়?

উত্তরদাতাঃ বর্তমানে আমার ছেলে এই গান পরিচালনা করছে, তাই ছেলের মুখেই শুনি যে আগের মানুষজন যেভাবে সারারাত ধরে একইভাবে আগ্রহের সাথে গান শুনত এখন মানুষ আর এই গান সেই ধৈর্যের সাথে শুনতে আগ্রহী ও উৎসুক নয়। তবে আগের দিনে আমাদের কালে প্রচুর আগ্রহ ও চাহিদা ছিল এই বিষহরা গানের। তাই সেই পুরনো দিনের মত করে গানের আগ্রহ ফিরে পেতে হলে আমাদের বিষহরা গানের সাথে যুক্ত মানুষদের ও শ্রোতাদের এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমানে আমাদের দলের সাথে যুক্ত বাদ্যযন্ত্রের, পোশাকের, মঞ্চসজ্জার, অভিনেতাদের সংলাপ বলার ধরণে অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে। আর আমার একটাই ইচ্ছে যে আমার অবর্তমানে এই বিষহরা গান ও দল যেন অটুট থাকে।

প্রশ্নকর্তাঃ এবারে আপনার মুখ থেকে কয়েকটা গান শুনে সাক্ষাৎকারটি শেষ করছি?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ, মায়ের বন্দনার দুটি গান গাইছি –

১) মাগো স্বর্গে ছিলেন পদ্মা স্বর্গেরও কুমারী
মর্ত্যে নামাইলেন শিব মনসা নাম ধরি
মর্ত্যে আসিয়া পদ্মা কি করিল
ঐ চাঁদ বংশ ধ্বংস করিল পূজারও লাগিয়া ...

২) আইসো মা পদ্মাবতী নম নম মা পদ্মাবতী
স্বর্গে ছিলেন মা স্বর্গের বিদ্যাধরী
মাড়েয়া পূজিবে মা তোমার চরণ বইসো বইসো মা
মাড়েয়া বানেয়া থুইছে উত্তম সিজ্ঞাসন
চৌয়ারি আসনে বইসো মা ...
স্বর্গে ছিলেন মা স্বর্গের বিদ্যাধরী
মাড়েয়া পূজিবে মা তোমার চরণ
বইসো বইসো মা
মাড়েয়া বানেয়া থুইছে উত্তম সিজ্ঞাসন
চৌয়ারি আসনে বইসো মা ...

সাক্ষাৎদানকারী ব্যক্তির স্বাক্ষর

সাক্ষাৎদানকারী ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের তালিকাঃ	
নাম	ননিবালা বর্মন
বয়স	৯৫
ছেলে-মেয়ে	৪ ছেলে ও ১ মেয়ে
নিজ বাসভবন	দক্ষিণ দীঘলটারী, ওকড়াবাড়ী, দিনহাটা, কোচবিহার।
দলের নাম	পুরনো- মা মনসা বিষহরা দল বর্তমান- মা মনসা নাট্যসংস্থা (দলের প্রধান- স্বয়ং নিজে)
দলে যোগদান	১৯৬৫-৭০
অবসর গ্রহণ	২০২০, এখনও কম দূরত্বে হলে অংশগ্রহণ করেন
দলের সদস্য সংখ্যা	প্রায় ২৫-৩০ জন
দলের সময়কাল	১৯৮৫-৯০ থেকে বর্তমান
দলের পরিসীমা/ বিস্তার	কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুরি, শিলিগুড়ি, আসামের গোয়ালপাড়া।

ক্ষেত্রসমীক্ষাঃ

প্রবেন্ধে ব্যবহৃত তথ্য ও সাক্ষাৎকার ক্ষেত্র সমীক্ষায় যাদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে,

১) গিদালী ননিবালা বর্মন (৯৫); দক্ষিণ দীঘলটারী, ওকড়াবাড়ী, দিনহাটা, কোচবিহার।
২) গীদালী চারুবালা বর্মন (৫৬); দক্ষিণ দীঘলটারী, ওকড়াবাড়ী, দিনহাটা, কোচবিহার।
৩) দীপক বর্মন (৪৫); হরিরহাট, গীদালদহ, দিনহাটা, কোচবিহার।
৪) বিধানচন্দ্র বর্মন (৬০); দিনহাটা, কোচবিহার।
৫) উপন বালা বর্মন (৭৫); ফুলবাড়ি, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার।
৬) গিরিন বর্মন (৭০); ফুলবাড়ি, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

1) উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির নানা দিগন্ত, প্রোমদ নাথ, ড. জীবন রানা (সম্পাদক)। দি সী বুক এজেন্সি। মুক্তারামবাবু স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৭। প্রথম প্রকাশ, আগস্ট, ২০১৭।
2) ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী। লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার। পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৩।
3) ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী। বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ। অর্পণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, মার্চ, ২০১২।
4) উপেন্দ্রনাথ বম্মর্ণ। রাজবংশী ভাষায় প্রবাদ প্রবচন ও হেঁয়ালি। প্রকাশকদ্বয় অজিত কুমার বর্মণ, শিবেন্দ্র নাথ রায়, নতুন পাড়া, জলপাইগুড়ি, ১৩৮৬।
5) জ্যোতির্ময় রায়। রাজবংশী সমাজ দর্পণ (১)। দি সী বুক এজেন্সি। মুক্তারামবাবু স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৭। প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০২২।
6) উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা। সম্পাদনায় ড জিতেশ্চন্দ্র রায়, শ্রী রতনচন্দ্র রায়। সোপান, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ, ২০১৪।

7) চারুচন্দ্র সান্যাল। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা। ১লা জানুয়ারি, ২০১৭।
8) গিরিজাশংকর রায়। উত্তরবঙ্গে রাজবংশী জাতির পূজা-পার্বণ। দেশ প্রকাশন, কলকাতা। ২০১৫।
9) মানস মজুমদার। লোক ঐতিহ্যের দর্পণে। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩। ১৯৯৩।

চিত্রতালিকার ক্রমঃ

১) চিত্র ১; ক্ষেত্র এলাকার মানচিত্র।
২) চিত্র ২; মাড়াই মূর্তির রূপ বর্ণনা।
৩) চিত্র ৩; মাড়াই দেবী সম্পর্কিত লোক ভাবনার প্রবাহচিত্র (Flowchart).